বাংলাদেশের অর্জন এবং শেখ হাসিনা

আজ থেকে চার দশক আগেও বাংলাদেশকে একটা তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে জানতো এবং চিনতো পুরো বিশ্ব। বিভিন্ন দেশ আর দাতা সংস্থার সাহায্য নিয়েই চলতো বাংলাদেশ। বিশ্ব দরবারে আমাদের পরিচিতি ছিলো হতদরিদ্র, গরিব রাষ্ট্র হিসেবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণতা ছিলো না। আর্থিক অবস্থা ছিলো একেবারেই দিনহীন। ছিলো না উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। দেশি কিংবা বিদেশী বিনিয়োগের পরিবেশ সে তো অনেক দূরের বিষয়। এ কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের কাছে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম না।

সেই দরিদ্র, ভঙ্গুর অর্থনীতির রাষ্ট্র বাংলাদেশের চেহারা আমূল পাল্টে গেছে গত প্রায় এক দশকেরও বেশি সময়ে। বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। সারা বিশ্বে আজ বাংলাদেশের পরিচিতি একটি উন্নয়নশীল এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে। বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমের চোখে বাংলাদেশ এখন আর আগের বাংলাদেশ নেই। এটি আগামী দেড় দশক পর অর্থাৎ ২০৪০ সালে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। সে লক্ষ্যে পাল্লা দিয়ে ছুটছে প্রতিদ্বন্দ্বি দেশগুলোর দিকে। এ কারণে বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর চোখ এখন ৫৫ হাজার বর্গ মাইলের ব-দ্বীপের দিকে। চীন, ভারত, জাপান, সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের দিকে। এসব দেশের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে তাদের বিনিয়োগের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। আর এ দিক থেকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে চীন।

এই যে মাত্র এক দশক সময়ে বাংলাদেশের চেহারাটা পাল্টে গেলো, বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে তাদের বিনিয়োগের উত্তম স্থান হিসেবে বেছে নিচ্ছে এবং নিলো তার নেপথ্যের কারিগর কিন্তু একজন। আপনি মানেন বা না মানেন স্বীকার করেন বা না করেন- তাতে কিছু যায় আসে না। সত্যটা হচ্ছে- গত এক দশকের বেশি সময়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে টেনে নিয়েছেন যিনি তিনি শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরী টানা তিনবার সহ চার বারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার হাত ধরেই আজ বিশ্ব দরবারে অনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ।

গত এক দশকের বেশি সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অবিস্মরণীয় উন্নতি করেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব নেতাদের কাছে বাংলাদেশ এখন গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ এখন উদীয়মান অর্থনীতির দেশ।

যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক সামিয়িকী দি ইকোনমিষ্টের সহযোগি প্রতিষ্ঠান ‘ইকোনমিষ্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআরইইউ) ‘ এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০৪০ এর মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ ২০টি দেশের অর্থনীতির একটি হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বাজারের আকার, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সম্ভাবনাময় কিছু খাতের ওপর ভিত্তি করে ইআরইইউ তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, চীনের বিনিয়োগকারীদের জন্য পছন্দের গন্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশ।

চীনের বিনিয়োগকারীদের কাছে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় তার একটা তালিকা তৈরি করে ইআরইইউ বলেছে, তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। অথচ ২০১৩ সালেও এই অবস্থান ছিল ৫২তম। অর্থাৎ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আগের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল।

ইআরইইউ’র প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এখন বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে ইলেকট্রনিক ভোগ্যপণ্য, তথ্য-প্রযুক্তিসেবা, টেলিযোগাযোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং গাড়ি শিল্প। প্রতিবেদন অনুযায়ি বাজার সম্প্রসারণমূলক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্যের দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। বাংলাদেশের আগে আছে ইন্দোনেশিয়া। আর পরের দিকে আছে ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া, মিশর, ভারত ও তানজানিয়া। আর সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক বিনিয়োগে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম।

তিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব দেশে ঝুঁকি কম এবং সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেই সূচকে সবার উপরে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের পরে রয়েছে কম্বোডিয়া, কলম্বিয়া, মিশর, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া ও ইসরায়েল। আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব গন্তব্য দেশের সুযোগ সবচেয়ে বেশি সেই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। অনেক দেশের বিনিয়োগকারীরা এখন এই বাজার ধরতে চান। ইআরইইউ এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী এক দশকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠির আকার

পাঁচ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

ইআরইইউ এর এই প্রতিবেদন বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ কতোটা গিয়েছে এবং কতোটা সম্ভাবনার দেশে পরিণত হয়েছে।

একটা দেশের উন্নয়নে বা উন্নতীতে নেতৃত্ব যে একটা বড় বিষয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যার পর প্রায় ৩০ বছর বাংলাদেশে পরিচালিত হয়েছিল ছিলো সামরিক শাসন আর স্বাধীনতা বিরোধীদের নেতৃত্বে। এই সময়টায় বাংলাদেশকে সব সময় দরিদ্র রাষ্ট্র হিসেবেই পরিচিত করে তোলা হয়েছিল গোটা বিশ্বে। যার ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু গত প্রায় দেড় দশক ধরে দেশের নেতৃত্বে দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তার সুযোগ্য, বিচক্ষণ ও দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্ব মানচিত্রে নতুন পরিচয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি সমৃদ্ধ, সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। এ কারণে আজ বিনিয়োগকারীরা ছুটে আসছেন বাংলাদেশে।

শুধু যে বিনিয়োগকারীরাই আসছেন তা নয়। বিশ্ব নেতাদেরও আগমন ঘটছে বাংলাদেশে। তেমনি ব্রিকস-এর মত শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোটেও বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ পেয়েছে। সর্বশেষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনেও বাংলাদেশ ছিল আমন্ত্রিত। শুধু আমন্ত্রিতই নয় সম্মেলনে প্রায় সব অধিবেশনেই অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সম্মেলনে অংশ নিয়ে বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকও করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে বিশ্বের প্রভাবশালী অনেক দেশের নেতারা এসছেন। সর্বশেষ রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভরভ ঘুরে গেছেন। রবিবার ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এ্যামানুয়েল ম্যাক্রো দুই দিনের সফরে ঢাকায় অবস্থান করছেন। তার এই সফরে দুই দেশের মধ্যে একাধিক বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে।

বিশ্ব নেতাদের এই সফর জিও পলিটিক্সে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়ছে। আর ইন্দোপ্যাসিফিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। এখানে বাংলাদেশের অবস্থানও নিরপেক্ষ। বাংলাদেশ সরাসরি কোন ব্লকের সাথে সংযুক্ত নেই। এ কারণে যেমন চাপে আছে

বাংলাদেশ, তেমনি সবার লক্ষ্যবস্তুতেও পরিণত হয়েছে।

ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশের যোগ্য নেতৃত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গত ২৯ আগস্ট “হিন্দুস্থান টাইমস” লিখেছে “দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক স্থিরতা এবং আঞ্চলিক উগ্রবাদীতা প্রশমনে শেখ হাসিনার ভূমিকা অনস্বীকার্য। যারা শেখ হাসিনার উপর অনভিপ্রেত চাপ দেয়ার চেষ্টা করে আসলে তারা এই ইন্দো প্যাসিফিকের শান্তিকে বিনষ্ট করতে চায়”।

শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের আত্মমর্যাদার প্রতীক পদ্মা সেতুতে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন থেকে পিছিয়ে আসা, আমেরিকার ভিসা স্যাংশন নীতি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য জাতিসংঘ, আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের চাপ, মার্কিন সিনেটরদের বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে চিঠি, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করার এতো চাপ সত্ত্বেও কোন কিছু থেকেই পিচিয়ে যায়নি বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ‘কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব’ পররাষ্ট্রনীতিতে অনড় রয়েছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সকল বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন নিজের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে। তাঁর এই সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন রাশিয়ার সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভারভ।

তিনি বলেছেন “যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও বাংলাদেশের বন্ধুরা বিদেশি শক্তিকে মোকাবিলা করে নিজেদের জাতীয় স্বার্থে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বজায় রেখেছে, যা প্রশংসার দাবী রাখে”। একই কথা বলেছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ চীনের প্রেসিডেন্ট শী জিনপিং।

বিশ্বনেতারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের স্বার্থে একটি সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাইলেও, তারা ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগি হিসেবে শেখ হাসিনাকেই চাইছেন। গত জুলাই মাসে বাংলাদেশে একটা জরিপ পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক রিপাবলিকান এসোসিয়েশন নামে একটি আমেরিকান সংস্থা। তাদের জরিপেও উঠে আসে বিষয়টি, সরকারের অনেক কর্মকান্ড বিশেষ করে দুর্নীতি আর আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে সমালোচনা করলেও ৯০শতাংশ জনগণ শেখ হাসিনার হাতেই নেতৃত্ব দেখতে চায়। শেখ হাসিনা শুধু নিজ দেশ বা আঞ্চলিক গন্ডিতেই না, উনি বিশ্ব পরিমণ্ডলে একজন প্রভাবশালী নেতা হয়ে উঠেছেন।

শেষ করতে চাই কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক জসিম মল্লিক এর একটা ফেসবুক স্ঠ্যাটাস দিয়ে। রবিবার তিনি একটি স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘ ‘অন্য জাতির লোকরা কখনও বাংলাদেশ নিয়ে নাক সিঁটকায় না যতটা আমরা নিজেরা সিঁটকাই। আমরা নিজেরাই নিজেদের ছোট করি। বিদেশে এসে দেশের বদনাম করি। দল করি। মিছিল মিটিং করি, মারপিট ঝগড়া ঝাটি করি। এই যে দেশ বিদেশে এক দেড় কোটি বাঙালি ছড়িয়ে আছে, মাথা উঁচু করে টিকে আছে সেটা কিভাবে হয়েছে! বাংলাদেশে নামটা এখন সবাই চেনে। সম্মান করে। ওয়েষ্ট আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাচোর লোকেরাও জানে বাংলা নামের একটা দেশ আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে চেনে। শেখ হাসিনাকে চেনে। একজন মুজিব জন্মেছিলেন বলেই আমরা সবুজ পাসপোর্ট পেয়েছিলাম। তা না হলে আমরা থাকতাম পাকিস্তানীদের বুটের তলায়। আমাদের মতো অকৃতজ্ঞও পৃথিবীতে সম্ভবত দ্বিতীয়টি নাই। যার বা যাদের জন্যই করবেন দেখবেন তারাই চোখ উল্টে ফেলবে। যেনো এটাই নিয়ম। সেটা কি সংসারে, কি রাষ্ট্রে। আমি সারাজীবন যাদের জন্য করেছি তারা কেউই সেসব মনে রাখেনি। নূন্যতম কৃতজ্ঞতাবোধও নাই। কেউ কেউ মনে করে পাওয়াটা তাদের অধিকার। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে চিনতেও কষ্ট হয়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা যায়। যেমন শেখ হাসিনা যে এতো করছেন এই দেশের জন্য তারপরও কিছু লোকের সেটা চোখে পড়ে না। ভাল লাগে না। কৃতঘ্ন বলেই বঙ্গবন্ধুকে সপারিবারে হত্যা করতে পারে। আচ্ছা শেখ হাসিনার অপরাধটা কোথায় যে জন্য তাঁকে টেনে হিচরে ক্ষমতা থেকে নামাতে হবে!’’

১৯৮৬ নির্বাচন: সংবিধান পরিবর্তন ও দীর্ঘমেয়াদী নীলনকশা

বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান। স্বাধীনতা বিরোধী এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনুগতদের মন্ত্রিসভায় স্থান দেয়া হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তাকে হত্যা করা হয়। এক বছরের

কম সময়ের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। অন্য সামরিক শাসনের মত এরশাদও বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমের জন্য বেসমারিকিকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং জাতীয় পার্টির সৃষ্টি
সামরিক শাসক হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে নানাবিধ আন্দোলন সংগ্রামের সম্মুখীন হন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। গ্রহণযোগ্যতা তৈরি ও গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সময়ক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রথমে তিনি বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন করেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পৌরসভা ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাজনীতিতে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে, পূর্বসুরি সামরিক শাসকের অনুকরণে ভিতরে ভিতরে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য কলকাঠি নাড়তে থাকেন। রাজনৈতিক দল গঠন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনার অনুমতি দেন এরশাদ। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাধারণ জনগণ, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজ অবস্থানের ম্যান্ডেট নেবার জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। এই গণভোটে সব ধরনের কারচুপি করে ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা ভোট লাভ করেন এরশাদ।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে তিন দফা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হয়। নির্বাচনের তারিখ প্রথমে ঘোষিত হয় ১৯৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ ছোট-বড় ২৮টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে ৩০০ আসনের জন্য ২১৫৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৫৩ জন। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন। এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটের নির্বাচন বর্জন।

সংবিধান পরিবর্তন
আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন শক্ত প্রতিরোধ সংসদে না থাকায় এরশাদকে

একপ্রকার সাহসী করে তোলে। নিজস্ব এজেন্ডা, জনগণকে প্ররোচিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসাবে ধর্মীয় আড়ালে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করে। যা তিনি পূর্বসুরি জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাকালীন সময়ে দেখেছেন এবং শিখেছেন। জিয়া হত্যার সাজানো অভিযোগে সামরিক বাহিনীর শেষ মুক্তিযোদ্ধাপন্থী গ্রুপের ১৩ জনকে হত্যা করে নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যান এরশাদ। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করার সময় রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় আবেগকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনেন। যেখানে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ অটুট রাখেন এবং ‘রাষ্ট্রধর্ম’ নামে নতুন একটি অনুচ্ছেদ-২ক যুক্ত করেন।

ওই বছরই এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ‘স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি’র ১৫ জন বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী উচ্চ আদালতে একটি রীট পিটিশন দাখিল করেন। রীট নাম্বার-১৪৩৪/১৯৮৮। যথেষ্ট সময় ক্ষেপণের পর এবং বাংলাদেশের যথেষ্ঠ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালের করা রীট আবেদনের সঙ্গে ২৩ বছর পর অর্থাৎ ২০১১ সালে একটি সম্পূরক আবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত সম্পূরক আবেদনের ওপর শুনানি শেষে ওই বছরের ৮ জুন বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল জারি করেন।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি বিরোধীদলে থাকলে এতো বড় সাহস এরশাদ পেতেন না। আওয়ামী লীগ বরাবরই গণতন্ত্রপন্থী ও নির্বাচনমুখী একটি দল, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল নির্বাচনের ম্যান্ডেটের মাধ্যমে স্বৈরাশাসককে জবাব দিতে। কিন্তু কোন এক দুরভিসন্ধি থেকে অথবা জিয়া হত্যায় ১৩ জনকে ফাঁসিতে ঝুলানোর কৃতজ্ঞতা থেকে হয়তো বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। এই কারণে উনাকে “আপোষহীন নেত্রী” উপাধি দেয় দলের লোকজন। কিন্তু এই তথাকথিত আপোষহীন নেত্রী সেদিন স্বৈরশাসককে যে ক্লিনশিট দিয়েছিল, যেভাবে গণতন্ত্রকামী এরশাদবিরোধী অন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত দলগুলোকে ছেড়ে গিয়েছিল, সেটাই বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। সেটাই ছিল ৭২’এর সংবিধানের উপর দ্বিতীয় পেরেক, যার প্রথমটি গেঁথেছিলেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। সেই পরিবর্তনের ক্রমধারায় বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, মাদ্রাসাশিক্ষার নামে পাকিস্থানি, তালেবানি,

আরবী সংস্কৃতি আমদানী করে আর বাংলাদেশ পিছিয়ে যেতে থাকে।

দীর্ঘমেয়াদী নীলনকশা
ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতির খেলা, যার শুরুটা করেছিলেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। যার পূর্ণতা দিয়েছিল স্বৈরশাসক এরশাদ, তার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী পরবর্তীতে হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। পূর্বজদের লিগ্যাসিকে সফলভাবে বাংলাদেশের সংবিধান ও জনগণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে দিতে সফলকাম হয়েছিল বিএনপি। যার ক্রমবিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, ধর্মবাদ বিস্তৃতি লাভ করেছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

জিয়ার ‘হ্যাঁ-না’ ভোট: নির্বাচন ব্যবস্থা সর্বনাশের সূত্রপাত

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা বৈধ গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে অবৈধ ক্ষমতা দখলদার সেনা শাসকদের হাতে চলে যায়। তারা নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয় সে সময়ের আর্মি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের উপর। জিয়ার তখন মূল অ্যসাইন্টমেন্ট খুনিদের বাঁচানো। এর জন্যে দরকার ছিল ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা। এজন্য তিনি ক্ষমতায় থেকে দল গঠন এবং একের পর এক নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা বৈধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। এর যেসব রাজনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার করতে থাকেন তার নির্বাচন ছিল অন্যতম। চলুন পাঠন আমরা দেখে নেই কেমন ছিল সেই নির্বাচনগুলো।

হ্যাঁ / না ভোট আয়োজন, ১৯৭৭ সাল
জিয়াউর রহমান তখন একইসাথে দেশের রাষ্ট্রপতি,সেনা প্রধান এবং প্রধান সামরিক আইন শাসক। সেনাবাহিনীতে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। দেশের ভেতরে রাজনৈতিক বিরোধীরা বিচ্ছিন্ন এবং দিশেহারা। তারপরেও জিয়াউর রহমানকে প্রমাণ করতে হবে, তার জনসমর্থন আছে। শুধু

বন্দুকের জোরে তিনি ক্ষমতায় বসেননি। তাই ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তার রাষ্ট্রপতি নিয়োগের বৈধতার জন্য প্রথমেই আয়োজন করে হ্যাঁ/না ভোটের। মূলত এই হ্যাঁ/না ভোটের মাধ্যমেই বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া শুরু হয়। এতে ভোটার উপস্থিতি ২ শতাংশের নিচে হলেও দেখানো হয়েছিল ৮৮ শতাং শ। আর প্রদত্ত ভোটের ৯৮ শতাংশই দেখানো হয় জিয়ার পক্ষে।

১৯৭৮এ অনিয়মে ভরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
২১ এপ্রিল,১৯৭৮ তারিখে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেন। নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ হয় ৩ জুন, ১৯৭৮। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়া ছিলেন জাতীয়তাবাদী জোটের প্রার্থী। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গণঐক্য জোটের প্রার্থী অবসর প্রাপ্ত জেনারেল এম এ জি ওসমানী। অথচ বাংলাদেশের আর্মি অ্যক্টের ২৯২,২৯৩ বিধিতে ছিল, সামরিক বাহিনীর কোন সদস্য তার চাকরির মেয়াদ শেষ না করে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না । এছাড়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন সরকারি চাকরিজীবী ও সরকারি বেতন গ্রহিতার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু জিয়া সব আইন ভঙ্গ করে ১৯৭৮ সালের ৩জুন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

সেসময়কার গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সরকারি চাকরিজীবীদের জিয়ার পক্ষ নিতে বাধ্য করা হয়। সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ছাপানো জিয়ার নির্বাচনী পোস্টারে পুরো দেশ ছেয়ে যায়। সরকারি গণমাধ্যমে ঢাকঢোল পিটিয়ে তার নির্বাচনী সমাবেশের খবর প্রচার করে।

অপর প্রার্থী ওসমানী অভিযোগ করেন, গণমাধ্যমে তার বক্তব্য বিকৃতভাবে হয়। তাকে নিয়ে একের পর এক ভিত্তিহীন রিপোর্ট প্রকাশ হয় সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায়। এই নির্বাচনে গণঐক্য জোটের ৪০জন কর্মীকে হত্যার অভিযোগ ওঠে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলা তথ্য পাওয়া যায় ২০০টির বেশি কেন্দ্রে। পোলিং এজেন্ট আর নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের বের করে দেয় সংবাদ ছাপা হয় দেশি পত্র-পত্রিকায়।

নির্বাচন কাভার করতে আসা নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক উইলিয়াম বর্ডার ১৯৭৮ সালের ৪ জুন প্রকাশিত রিপোর্টে প্রচুর জাল ভোট আর প্রতিপক্ষ এজেন্টদের নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বের করে দেবার খবর এবং ছবি ছাপে। তার পরেও শতকরা ৭৬ ভাগ ভোট দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি হন জিয়া।

প্রশ্নবিদ্ধ ১৯৭৯ সালের নির্বাচন
১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমান তার একক নেতৃত্বে রাজনৈতিক দল বিএনপি গঠন করেছিলেন। তার সামরিক ক্ষমতা বেসামরিক মোড়ক পরিয়ে পাকাপোক্তভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন জিয়াউর রহমান। আবদুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে ছিল তার প্রধান প্রতিপক্ষ।

১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও দুর্নীতির অভিযোগ ওই সময়ের কোন কোন গণমাধ্যম প্রকাশ করে। অভিযোগ আসে গুণ্ডা বাহিনীর কেন্দ্র দখলের। পাশাপাশি সেনাবাহিনীসহ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগ প্রার্থী এবং নেতা কর্মীদের উপর চালানো হয় অত্যাচর ।

সংবিধান লঙ্ঘন করে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, পিডিবি এবং নেজামে ইসলামের যুদ্ধাপরাধীদের নতুন জোট ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কারচুপির সুযোগ দিয়ে তাদেরকেও ২০টি আসনে জয়ী দেখানো হয়। জিয়ার বিএনপিকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ২০৭টি আসনে বিজয়ী ঘোষণা করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে কবর দেয়া হয়েছিল, জিয়া তা কবর থেকে তুলে এনে নতুন জীবন দিয়েছিলেন। বিএনপির মনোনয়নে বিপুল সংখ্যক দালাল ও স্বাধীনতা বিরোধীকে বিজয়ী করে জাতীয় সংসদে আনা হয়। রাজাকারদের পবিত্র সংসদে ঢোকার সুযোগ করে দেন জিয়া।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং পাকিস্তানের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘে ছুটে যাওয়া শাহ আজিজুর রহমান এবং রাজিয়া ফয়েজের মত কুখ্যাত রাজাকারদের জিয়াউর রহমান ভোটকারচুপির মাধ্যমে জিতিয়ে এনেছিলেন সে নির্বাচনে।

ড. ইউনূসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নাগরিক শক্তির মৃত্যু

প্রতিবছর পৃথিবীর নানা দেশ তাদের ভালো কাজগুলোর স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অপেক্ষা করে। সেইসব ভালো ও কার্যকর আবিস্কার ও সামাজিক কাজগুলোকে এগিয়ে নিতে নানা পৃষ্ঠপোষকতাও করে। এটি এক অনন্য সম্মান। সেই সম্মান বাংলাদেশের ঘরে আসার পরেও হোঁচট খেয়েছিলো।

হ্যাঁ, কথা হচ্ছিলো ড. ইউনুসকে নিয়ে। নোবেল পেয়ে তিনি নিজেকে তার যোগ্য করে প্রকাশ করতে না পেরে পরিচিতি পেয়েছিলেন নেতিবাচক নানা তকমায়। ২০০৭ সাল সেটাকে ত্বরান্বিত করেছিলো। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে ২০০৭ সালের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়কের সময়টা ছিলো কালো অধ্যায়। একদল মানুষ রাজনীতিতে সংস্কার আনার নামে দেশকে বিরাজনীতিকরণের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলো প্রধান দুই দলকে নিস্ক্রিয় করার মাধ্যমে। সেই সময়টাকে স্বর্ণমুহুর্ত হিসেবে লুফে নেন ড. ইউনুস তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিতে। ঘোষণা দেন – তার নেতৃত্বে নতুন এক রাজনৈতিক দল হবে, যার নাম হবে নাগরিক শক্তি।

বেশিদিন সময় নেননি তিনি। নোবেল পুরষ্কার লাভ করার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক দল গঠন করার কার্যক্রম শুরু করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন তিনি। সেসব দিন আমরা যারা ভুলে গেছি তারা আরেকবার স্মরণ করি এই মানুষটির শিখরে ওঠার আকাঙ্ক্ষাকে।

শোনা যায়, সেই আকাঙ্ক্ষার জায়গা এতোই প্রকট ছিলো যে ফখরুদ্দিন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার আগে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে অধ্যাপক ইউনূসকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। সেটিও তিনি ফিরিয়ে দেন। কোন সৎ উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এমন নয়। কেনো করেছিলেন এমন? হিসেব ছিলো পরিস্কার। স্বল্প মেয়াদী সরকার হওয়ায় কেয়ারটেকার প্রধান হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হননি ড. ইউনূস। তার স্বপ্ন ছিল দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা। আর এ জন্য ‘নাগরিক শক্তি’ নামে নতুন দল গঠনও করেছিলেন।

তারপর কী হলো? সেই দল কোথায় গেলো। তার উদ্দেশ্য যে সৎ ছিলো না তা নাগরিক শক্তির ঘোষণা ও সাগরিক শক্তি না করার ঘোষণা দুটো

থেকেই স্পষ্ট হয়। চলুন পিছনে ফিরে যাই। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ভারত সফরে যান। সে সফরে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবার জোরালো সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। ৩১শে জানুয়ারি দিল্লীতে এক সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, দেশের পরিস্থিতি বাধ্য করলে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন। দেশকে উদ্ধারের প্রকল্প নিয়ে হাজির হওয়া ইউনুস বলেছিলেন, রাজনীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার মতো ব্যক্তি আমি নই। কিন্তু পরিস্থিতি যদি বাধ্য করে তাহলে রাজনীতিতে যোগ দিতে আমি দ্বিধা করবো না।

নাগরিক শক্তির মৃত্যু ঘটেছিলো ইউনুসের হাত ধরেই। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত দুই নেত্রীকে রাজনীতি থেকে বাইরে রাখা কিংবা বিদেশে পাঠিয়ে দেবার নানা চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অধ্যাপক ইউনূস সে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন মাত্র। তিনি ঘোষণা দিয়েও সামাল দিতে পারেননি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে না। সে পরিস্থিতিতে ডঃ ইউনুস নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে যান।

অনেকের সঙ্গে দল নিয়ে আলাপ করলেও তিনি গ্রীনসিগন্যাল পাননি। ফলে ২০০৭ সালের ৩রা মে অধ্যাপক ইউনূস রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন। রাজনীতিতে আসার জন্য তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে যে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন তার তিনমাসের মধ্যেই সে প্রক্রিয়া থেকে সরে আসেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
এবং তার সেই নাটকের জবনিকাপাত ঘটেছিলো আবারও একটি খোলা চিঠি দিয়েই। এজন্য তিনি জাতির উদ্দেশ্যে একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে সে চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, “যাদেরকে সঙ্গে পেলে দল গঠন করে জনগণের সামনে সবল ও উজ্জ্বল বিকল্প রাখা সম্ভব হতো তাদের আমি পাচ্ছি না। আর যারা রাজনৈতিক দলে আছেন তারা দল ছেড়ে আসবেন না। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এ পথে অগ্রসর না হওয়াই সঠিক হবে মনে করে এ প্রচেষ্টা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

এই যে রাজনৈতিক দল করার আকাঙ্ক্ষা এবং যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে পিছিয়ে পড়া সেখানো কোথাও ড. ইউনুস নিজেকে সমালোচনা করেননি। তার মতো একজন ব্যক্তির সেটাই করার কথা ছিলো। কেনো তিনি যথেষ্ট সাড়া পেলেন না সেখানেও তিনি কখনওই নিজের কমতি দেখতে পাননি। সবসময়েই তিনি অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলেছেন। কখনও দোষ জনগনের, যারা তার উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম ছিলো, কখনও

দোষ মাঠের রাজনীতিবিদদের, যারা তার ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজি হননি, কখনও দোষ সময়ের, যে সময়ে ‘ফাঁকা মাঠেও’ তিনি গোল দিতে পারেননি।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন বেশি বিএনপি-জামায়াত আমলেই

“বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট, তোমরা একজন একজন করে এসো, নইলে ও মরে যাবে।” ১৩ শব্দের বাক্যে একজন মায়ের আকুতি কী আমরা ভুলে গেছি। সন্তানের উপর কোতোটা বরবর নির্যাতন হলে একজন মা এভাবে আকুতে জানাতে পারে? কিন্তু মায়ের চোখের জল আর গগন বিদারী আহাজারীতেও নরপিশাচদের এতোটুকু মন গলেনি।

পূর্ণিমা রাণী শীলের বাড়ি সিরাজগঞ্জের উল্লাপড়ায়। ২০০১ সালে পূর্ণিমার বয়স মাত্র তেরো বছর। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সে। গ্রামের ৮-১০টি কিশোরীর মতো উচ্ছল চঞ্চল প্রাণে বেড়ে উঠছিল। কিন্তু ১৩ বছর বয়সে, ২০০১ সালের ৮ অক্টোবর তার জীবনে নেমে আসে কালো অন্ধকার। তছনছ করে দেয় তার তারুণ্যে ভরা জীবনকে। সেই রাতে পূর্ণিমার বাড়িতে হামলা চালায় বিএনপি-জামাতের নেতাকর্মীরা। এরপর পূর্ণিমা আর তার মা’কে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির পাশের একটি ক্ষেতে। পনেরো থেকে বিশজন বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডার ধর্ষণ করে কিশোরী পূর্ণিমাকে। মায়ের সামনেই মেয়ের ছোট্ট শরীরটার ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল নরপিশাচের দল। কান্না করতে করতে পশুগুলোর কাছে মিনতি করছিলেন মা। বলছিলেন, “বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট তোমরা একজন একজন করে এসো, নইলে ও মরে যাবে।”

ছবি রানীর বাড়ি বাগেরহাটের রামপালে। ২০০২ সালের ২১ শে আগস্ট তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট বাহিনীর নেতাকর্মীদের গণধর্ষণের শিকার হন তিনি। বাসস্ট্যন্ড থেকে ছবি রানীর কাপড় খুলে ফেলে বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডারবাহিনী। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিএনপি অফিসে। এরপর পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করা হয়। নরপিশাচরা শুধু ধর্ষণ

করেই ক্ষান্ত হয়নি, ছবি রানীর গোপন অঙ্গে মরিচের গুড়া, বালি আর কাচের গুড়া ঢুকিয়ে নির্যাতন করে।

২০০১ সালের ১৬ নভেম্বর ভোলা জেলার চরফ্যাসন উপজেলায় বিএনপি নেতাকর্মীরা ২০০ হিন্দু নারীকে গণধর্ষণ করে। সবচেয়ে ছোট ভিকটিমের বয়স ছিল 8 বছর আর সবচেয়ে বড়টির বয়স ছিল ৭০ বছর। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সারাদেশে এমন কয়েকশ’ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। চক্ষুলজ্জা আর প্রাণের ভয়ে অনেক তা প্রকাশ্যে আসেনি। তাদের সবার অপরাধ ছিল, তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং তারা বঙ্গবন্ধুর নৌকার সমর্থক।

২০০১ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই সনাতন ধর্মালম্বীদের উপর হামলা শুরু হয়, যা চলে পরবর্তী পাঁচ বছর। বাগেরহাট, বরিশাল, ভোলা, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, গাজীপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, নাটোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ জেলায় হিন্দুদের উপর পরিকল্পিত হামলা হয়। দ্বীপ জেলা ভোলায় প্রায় দুই মাস ধরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের উপর নির্যাতন চলে। যোগাযোগব্যবস্থা খারাপ থাকায় প্রশাসনের লোকজন এমনকি সংবাদকর্মীরাও নির্যাতনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। সেসময় সারাদেশে বাড়িঘর লুটপাট, বাড়ি থেকে উচ্ছেদের মতো অজস্র ঘটনা ঘটে। এসবের অধিকাংশই পুলিশের নথিভুক্ত হয়নি। ভুক্তভুগীরা ভয়ে কোন অভিযোগ পর্যন্ত করেননি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব বলছে, ১৯৯৬, ২০০১ বা তার আগের প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক পরের বছরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টা বেশি। শুধু ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যায় ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর। ১৯৯৬ এর নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২১৪টি, পরের বছরে ৫৫৪টি । ২০০১ সালে ধর্ষণের ঘটনা ৫৬৬টি হলেও পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯১টিতে। ২০১৪ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৫৪৫টি, পরের বছরে এ সংখ্যা ছিল ৬৯০। ২০১৮ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ৫৫৬টি, পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৭টিতে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য ‘হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ’ নামে একটি সংগঠন হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করে। হাইকোর্ট এক আদেশে নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে

একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন। এক বছরের বেশি সময় তদন্ত শেষে ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল সরকারকে ৫ খণ্ডের ১ হাজার ১০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দেয় কমিশন। প্রতিবেদনে দোষীদের চিহ্নিত করা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশের নির্দেশনা চেয়ে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ হাইকোর্টে আরেকটি রিট দায়ের করলে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিবেদন ২০২২ সালের ১ এপ্রিল গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

তদন্ত কমিশনের ওই প্রতিবেদনে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ঢাকায় ২৭৬টি, চট্টগ্রামে ৪৯৭টি, সিলেটে ১৭টি, খুলনায় ৪৭৮টি, রাজশাহীতে ১৭০টি এবং বরিশালে সর্বাধিক ২ হাজার ২২৭টি ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৯২টি হত্যা, ১৮৪টি ধর্ষণ-সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনারও উল্লেখ আছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বারবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কেন নিযাতনের শিকার হন? বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ। নির্বাচনের মাঠে এই ১০ ভাগ ভোটারই জয় পারাজয়ে অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে। সংখ্যালঘু ভোটারদেরকে বলা হয়, আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক। যদিও গবেষণায় দেখা যায়, সংখ্যালঘু ভোটাররা সব সময় যে একটা দলের পক্ষে ভোট দিয়েছে বা আনুগত্য প্রকাশ করেছে বিষয়টি এমন নয়। বাংলাদেশের বিভক্ত রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোটও বিভক্ত হয়ে পরে এবং কোন দলের প্রতি তাদের সমর্থনও প্রত্যাহার করে। সুতরাং সংখ্যালঘু ভোটার মানেই আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক এই বাস্তবতা সত্য নয়। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের প্রথম হামলার শিকার হন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে আওয়ামী নেতৃত্ব মুছে ফেলা এবং যুদ্ধপরাধীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে পাকিস্থানের পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশ থেকে সনাতন ধর্বলম্বীদের সমূলে উৎখাতের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে জামায়াত-বিএনপি জোট। তাই প্রতিবার নির্বাচনে তারা হারলে বা জিতলেও সবচেয়ে বড় আক্রোশ মিটিয়েছে হিন্দুদের নির্যাতন, ধর্ষণ আর দেশ থেকে থেকে বিতাড়িত করে।

তবে এখন আর ভয় পাওয়ার সময় নেই। রুখে দিতে হবে নরপশুদের। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেদের দাঁড়াতে হবে। কারণ এই দেশটি সবার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

‘নিজেদের সংখ্যালঘু মনে না করে, মনে করবেন আপনারা এই দেশেরই নাগরিক। সমান নাগরিক অধিকার আপনারা ভোগ কখনো নিজেদের মনে হীনম্মন্যতা নিয়ে আসবেন না।’

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ওবামা, হিলারি এবং কেরি কেনেডিকে খোলা চিঠি…

প্রিয় আমেরিকান ত্রয়ী। আমি সেরকম কেউ নই। খুব সাধারণ মানুষ। ১৬০ তো বটেই আপনারা যদি ১০৬০ জন বিশিষ্ট মানুষের তালিকা করেন তার মধ্যে আমার নাম পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি আপনাদের নোবেল জয়ী বন্ধু ড. ইউনূসের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের সরকার প্রধানকে যে বিব্রতকর খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন তার প্রতিবাদ করেছেন আমার দেশের ১৭১ জন নাগরিক। এর মধ্যেও আমার নাম নেই। তবু আমি বিব্রত। আমি কেন, যেকোন মিথ্যাচারে বহু মানুষ বিব্রত হয়। আমি আসলে তাদের প্রতিনিধি।

কোন ভুমিকায় না গিয়ে একটি বিষয় আমি সরাসরি বলতে চাই। ইউনূস সাহেবের ব্যাপারে আপনার না জেনে, না তদন্ত করে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। আজ বলে নয়। অনেক দিন ধরেই দিচ্ছেন। যেটা আপনাদের সারা জীবনের ক্যারিয়ারের সঙ্গে সাংঘার্ষিক। ভুল বুঝবেন না দয়া করে। আমি সরকারের পক্ষ নিচ্ছি না। আমি প্রথমত বিব্রত আপনাদের জন্যে। কারণ আপনাদের জানি। আপনারা যার যার ক্ষেত্রে এভারেস্ট সমান উঁচু। নিজের দেশতো বটেই সারা পৃথিবীর মানুষের কথা আপনারা ভাবছেন। কাজ করছেন। শুধু বাংলাদেশের সামনে এসে কেন বিতর্কিত হবেন?

তবু যদি বলেন এটা আপনাদের ব্যক্তিগত আচরণ। তাহলে হয়তো এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু মূল সমস্যাটা বর্তমান সময়ের। সামনে আমাদের জাতীয় নির্বাচন। এই সময়ে আপনাদের চিঠির মধ্যে লাভের আশা খুঁজছে একটি গোষ্ঠী। আর আপনাদের বন্ধু এক ঢিলে দুই পাখি মারছেন। নিজের অন্যায়ের পক্ষে জনমত গঠনও হচ্ছে, সরকারের ওপর ঝোপ বুঝে কোপ মারাও হচ্ছে। আর আপনারা এর ক্রীড়ানক হচ্ছেন। তার পরেও যদি এটাই

আপনাদের ইচ্ছে হয় আপনারা আপনাদের বন্ধুর পক্ষে বলুন। কিন্তু তদন্ত করে বলুন। আমি নিশ্চিত আপনাদের বন্ধু সব কথা বলেননি। আমি আপনাদের জন্যে সেরকম কিছু না বলা কথা এই চিঠিতে হাজির করছি।

আমাদের একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ছিলো, নাম ২০০০। ওই পত্রিকায় ২০০৯ সালের মে মাসের একটি সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছিল ‘সুফিয়ার কবর চাঁদার টাকায় / ইউনূসের হাতে নোবেল’খবরের বিষয়বস্তু, আজকের আলোচিত ইউনূস সাহেব ১৯৭৪ সালে তার ক্ষুদ্রঋণের কাজ শুরু করেছিলেন নিজের গ্রাম থেকে। প্রথম ঋণটি তিনি দিয়েছিলেন এই খবরের সুফিয়া বেগমকে। তিনি গ্রামের মানুষকে জানিয়েছিলেন ইউনূসের গ্রামীণব্যাংকের কথা। খুব অল্প দিনেই দারিদ্র্য পিড়ীত ওই গ্রামে নগদ টাকার মহোৎসব লেগেছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সুফিয়াসহ বহু ঋণ গ্রহিতা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন।

১৯৯৮ সালে এই সুফিয়া মারা যান প্রায় বিনা চিকিৎসায়। গ্রামের মানুষ চাঁদা তুলে তার দাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এই ক্ষুদ্র ঋণ, দেশের বেশিরভাগ এলাকায় টেকসই হয়নি। যেসব সংগঠন দরিদ্র মানুষকে টাকা দিয়ে মনিটরিং করেছিলো, তাদের ক্ষেত্রে কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ এলাকায় মানুষ হয়েছে ঋণ নির্ভর। এতে ক্ষুদ্র ঋণের বাজার বড় হয়েছে। কিন্তু মানুষের ভাগ্য ফেরেনি। ঋণের চাপে কত মানুষ আত্মহত্যা করেছে তা রীতিমত গবেষণার বিষয় । আপনারা চাইলে কাজটি করে দেখতে পারেন। গোপনে আপনাদের দূত পাঠাতে পারেন ইউনূস সাহেবের মডেল গ্রাম জোবরায়। আজও সেখানে ক্ষুদ্র ঋণের হাহাকার কাটেনি।

আসি যে মামলার সূত্র ধরে আপনারা ইউনুস সাহেবের জন্যে উদ্বিগ্ন, সেটা নিয়ে । পত্রপত্রিকার তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে গ্রামীণ টেলিকম নামে একটা কোম্পানির ১৭৬ জন কর্মকর্তা “শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল” এর প্রাপ্য হিস্যা চেয়ে ১১০টি মামলা করেন। ইউনূস আইনজীবী নিয়োগ করে আদালতের বাইরে এসব অভিযোগ নিষ্পত্তি করেন। সেই নিষ্পত্তিতে তিনি কর্মচারীদের ৪৩৭ কোটি টাকা শোধ করেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ১০৬ টি মামলা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু চাকরির শর্ত অনুযায়ী, কোম্পানি মুনাফার ৫ শতাংশ পাওয়ার দাবিতে শ্রম আদালত এবং হাইকোর্টে আবারও মামলা করেন তারা।

কিন্তু এই মামলা নিষ্পত্তির জন্যে ইউনূস আইনজীবীদের নিয়মের বাইরে প্রচুর টাকা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে বের হয়ে আসে, গ্রামীণ টেলিকমের আইনজীবী ইউসুফ আলী ও জাফরুল হাসান

শরীফের তিনটি ব্যাংক হিসাব ও ইউসুফ আলীর ‘ল’ ফার্ম এটর্নিসের নামে ১৬ কোটি টাকা দেয়া হয়। দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তারা গণমাধ্যকে জানান, ‘শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল’ কর্মীদের পাওনা সংক্রান্ত অভিযোগ ধামাচাপা দিতে ড. ইউনূস বড় অংক দিয়ে আইনজীবী ভাড়া করেন। কথা ছিল এরা মামলাকারীদের সাথে আদালতের বাইরে পুরো বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন।

শুধু তাই নয় ‘শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল’এর হাজার হাজার কোটি টাকা চুরির অভিযোগ ধামাচাপা দিতে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করেন ইউনূস। দুদকের অনুসন্ধানে এসব অভিযোগেরও সত্যতা মেলে। ২০২২ সালে তাদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে দেয়া হয়। কর ফাঁকি মামলায় দোষী হন ইউনূস। দোষী সাব্যস্ত হবার পর দিনই উনি ১২ কোটি টাকা কর দেন। কর দিয়েই তিনি প্রমাণ করেন তিনি দোষী ছিলেন।

সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য উঠে আসে তার ট্রাস্ট গঠনের আড়ালে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধানে। দেখা যায় নিজের পরিবারের ব্যয়ের টাকাও এ ট্রাস্ট থেকেই নিতেন ইউনূস। এছাড়াও নিতেন উৎসব আপ্যায়ন খরচ এবং টেলিফোন বিল। কিন্তু আইন বলে, কোন কিছু ট্রাস্ট করলে সেখান থেকে খরচ নিতে পারবেন না দাতা। কিন্তু ট্রাস্ট না করে ওই একই কাজ যদি তিনি ব্যবসা হিসাবে করেন, তাহলে পারেন। কিন্তু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর আর ট্রাস্টের কর এক নয়। কেউ সমাজসেবা করলে, তার কাছ থেকে কম কর নিয়ে উৎসাহ দিতে পারে সরকার।

মোট তিনটি ট্রাস্ট গঠন করেন ইউনূস। একটি ট্রাস্টে এমন বিধান রাখেন, যেখান থেকে তিনি নিজে এবং তার পরিবারের সদস্যরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। অথচ ট্রাস্ট গঠনের আইনে এরধনের কোন নিয়ম নেই। এছাড়াও ইউনূসের নামে শেল কোম্পানি গঠন করে এক কোম্পানির লাভ আরেক কোম্পানিতে দান করে কর ফাঁকি দেয়ার নজির পায় দুদক। শুধু গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের জমা ৫% লভ্যাংশের হিসাবে ৩৬০০ কোটি টাকা ইউনূস অন্য কোম্পানিতে দান হিসাবে সরিয়ে দেন।

এই প্রতিটি ঘটনায় বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে। আপনারা আজীবন সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষায় কথা বলেছেন । তাই নিশ্চয়ই আপনাদের বোঝানোর দরকার নেই যে, বাংলাদেশের সাংবিধানিক কোন কাজ নিয়ে কথা বলতে হলে নিশ্চয়ই তথ্য প্রমাণ নিয়ে কথা বলতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনারা কোন দায়িত্বশীলতা দেখাচ্ছেন না।

আমরা জানি বেলারুশে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এলেস বিয়ালিয়াটস্কির দশ বছরের জেল হয়েছে, আপনাদের কোন আওয়াজ পাওয়া যায়নি। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ফিলিপাইনের সাংবাদিক মারিয়া রেসা কর ফাঁকির মামলায় আদালতে ঘুরছেন। আপনাদের সেখানেও দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের সামনে নির্বাচন। এই সময় সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ নিয়েও আপনাদের উদ্বেগের শেষ নেই। নির্বাচনের আগে একটি দায়িত্বশীল সরকার আপনাদের এই দায়িত্বহীন কথার বলি হতে পারে, সে বিষয়টি কি আপনারা আমলে নেন না? এতে কী নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু থাকছে? আমাদের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নিয়ে দুর্নাম নেই। অথচ আপনাদের চিঠিতে এরকম একটি বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে বলছেন। কাজটি কী ঠিক করছেন?

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ জানে না যে আপনার দেশে ডোনেশন বলে একটা কথা বলানোর বৈধ প্রথা আছে। রাজনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চ্যারিটি সংগঠন থাকে। সেখানে সেবামূলক কাজের খরচ দিলে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে বিবৃতি পাওয়া সম্ভব। ক্রেস্ট কিম্বা সাটিফিকেটও পাওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে দাওয়াতেও তারা আসতে পারেন। কিন্তু সেখানে কোন কিছুই ফ্রি করার প্রথা নেই। আনারা সেই প্রথার বাইরে শুধুই বন্ধুত্ব করছেন এরকম নিশ্চয়ই নয়? করুন, শুধু অনুরোধ জেনে বুঝে করুন।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

পাঠকের হৃদস্পন্দনে উচ্চারিত একটি শব্দ ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

পাঁচ বছর পূর্ণ করে ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণ করলো আমাদের প্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন। শোষক সমাজের রক্তচক্ষু, পদে পদে বাঁধা ডিঙিয়ে প্রতিটি দিন পার করে চলেছি আমরা। তবে যতটা রক্তচক্ষুর ভয়, তার চেয়ে বেশি পেয়েছি পাঠকদের প্রাণভরা ভালোবাসা। পাঠকদের ভালোবাসায় মেহেরপুর প্রতিদিন এখন উচ্চারিত শব্দ। আমরা পাঠকদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। গেল পাঁচ বছরে মেহেরপুর

প্রতিদিন মানুষের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। আমাদের প্রতিদিনের সংখ্যা, একেকটি জবাবদিহীতার অংশ হিসেবে কাজ করে। আমাদের জবাবদিহীতা সমাজের কাছে, সাধারণ জনগণের কাছে, পাঠকদের কাছে। প্রতিদিন ভোর হয় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্য নিয়ে। মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে বদ্ধ পরিকর।

সীমান্তবর্তী ছোট্ট জেলা মেহেরপুর থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখা অনেক দুরহ একটি কাজ। যেখানে ছাপাখানা নেই, পত্রিকা মেকাপ করার জন্য মেকাপম্যান পাওয়া যায় না। প্রিন্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেসিং পেপার ও কালিও পাওয়া যায় না। পত্রিকার রসদ যোগানো বিজ্ঞাপনদাতা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানও নেই। কালেভদ্রে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন পেতেও যে পরিমাণ বেগ পেতে হয়, তা আর নাই বললাম। সঙ্গে রয়েছে কাগজ, কালীসহ বিভিন্ন উপকরণের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি। অসংখ্য অসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে একটি দৈনিকের পাঁচ বছর অতিক্রম করার ব্যাপারটি ছোট করে ভাবারও কিছু নেই। আমরা সেই ভাবনার কাজটি করে চলেছি।

সংগত কারণেই এ নিয়ে আমরা আনন্দিত, গর্বিত। আমরা পেরেছি। একটা জায়গায় মেহেরপুর প্রতিদিনকে দাড় করাতে পেরেছি। এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অগণিত পাঠক আর শুভানুধ্যায়ী। মেহেরপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষেরভালোবাসা আমাদের প্রধান শক্তি। পাঠকসাধারণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে পত্রিকাটি আমরা করোনার অতিমারিতেও প্রকাশ করে গেছি। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠকই আমাদের সবচাইতে বড় শক্তি, বড় শ্রদ্ধার জায়গা। তাদের হাতে প্রতিদিন একটি গ্রহণযোগ্য পত্রিকা তুলে দেওয়ার চেষ্টা পাঁচ বছর ধরে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছি। আগামী দিনেও এই নিষ্ঠা দৃঢ়ভাবে বজায় রাখব। মাঝে মধ্যে যে আমাদের ভুল হয়না এমনিটও নয়। ভুলত্রুটিগুলোর দায় নিয়ে সামনের দিনগুলোতে আরো ভালো করার চেষ্টা করবো।

‘জনগণের মুখপত্র’ এই স্লোগানের স্বাক্ষর রেখে যা কিছু জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে সেধরণের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমাদের সহকর্মীরা নিরলস কাজ করছে। সংবাদের ভিতরকার সকল সত্য প্রকাশ কার চেষ্টা করেছি। অসততা আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তবে আমরা নিরপেক্ষ নই। আমরা মানুষের পক্ষে। প্রতিটি সাধারণ মানুষ, প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পক্ষে আমাদের কলম চলবে। দেশের মানুষই আমাদের মূলশক্তি।

২০১৮ সালের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের দিন যাত্রা শুরু

করেছিল মেহেরপুর প্রতিদিন। স্বাধীনতার এই মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের যুদ্ধে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতার দীপ্ত চেতনায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। অদম্য সাহস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার অংশিদার আমরাও।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন একজন তরুন রাজনীতিবীদ এবং স্বপ্নচারী মানুষ। মেহেরপুর প্রতিদিনের মত আরো কয়েকটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। একজন গণমাধ্যমবান্ধব হিসেবে তিনি সমাজে সুপ্রতিষ্টিত এক চরিত্র। তাঁর সুদক্ষ দিকনির্দেশনায় আমরা মেহেরপুর প্রতিদিনকে নিয়ে গেছি এক অনন্য উচ্চতায়। যা এখন মেহেরপুরের প্রতিটি মানুষের উচ্চারিত একটি নাম। একটি শব্দ মেহেরপুর প্রতিদিন।

মেহেরপুর প্রতিদিন যা পারে, যা পেরেছে অন্য কেউ পারেনি, পারেনা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এই আমাদের প্রতিজ্ঞা মেহেরপুর প্রতিদিন মানুষের মুখে মুখেই উচ্চারিত হতে থাকবে সবসময়। অর্ধযুগে পদার্পণের এই শুভক্ষণে সকল পাঠক, শুভান্যুধায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা, কলাকুশলীর প্রতি শুভেচ্ছা।

বজ্রপাত থেকে ক্ষতি এড়াতে নির্দেশনা মেনে চলি

মেহেরপুরে গতকাল মঙ্গলবার বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে আবু বক্কর সিদ্দিক (৪৫) নামে এক কৃষক মারা গেছেন। আহত হয়েছেন দুই গৃহবধুসহ চার জন। নিহত আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে। এছাড়া আহতরা হলেন, সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আঙ্গুরা খাতুন (৩০) ও রাজাপুর গ্রামের কহিনুর বেগম (২৫), রাধাকান্তপুর গ্রামের কৃষক আহসান আলী (৪০) ও রহমতুল্লাহ ।
এছাড়া মেহেরপুর শহর সহ বেশ কিছু এলাকায় বজ্রপাতে গাছ পুড়েছে, বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিকল হওয়ার মত ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

বর্ষা মৌসুমে সবচেয়ে ভীতিকর বিষয় হচ্ছে বজ্রপাত। সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এই সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। যে সাবধানতাগুলো মেনে চললে বজ্রপাতে হতাহতের ঝুঁকি হৃাস পাবে।

সাবধনাতা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায় ডা, জমির মো: হাসিবুস সাত্তার ফায়ার সার্ভিসের নির্দেশনাগুলো তার ফেসবুকে জনসাধারণ জন্য তুলে ধরেছেন। সময়োপযোগী এ বিষয়টি সবার সামেন তুলে ধরার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

তার পোস্ট থেকে নেওয়া নির্দেশনাগুলো হলো- ১।বজ্রপাতের ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না। ২. প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন। ৩. খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যান। ৪. কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যান। ৫. খোলা জায়গায় কোনো বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া যাবে না। গাছ থেকে চার মিটার দূরে থাকতে হবে। ৬. ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক তারের নিচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে। ৭. ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।৮. বজ্র পাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা দিতে হবে। ৯. এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। এই সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেলে ঘরে অবস্থান করুন। ১০. যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। ১১. বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকবেন না এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
১২. ঘন-কালো মেঘ দেখা গেলে অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন। ১৩. উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন। ১৪. বজ্রপাতের সময় জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন। ১৫. বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, মাঠ বা উঁচু স্থানে থাকবেন না। ১৬. কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা, জলাশয় থেকে দূরে থাকুন। ১৭. বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন। ১৮. বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল

দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন। ১৯. বজ্রপাতের সময় গাড়ির মধ্যে অবস্থান করলে, গাড়ির থাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। ২০. বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।

তাই আসুন, সাবধানতা অবলম্বন করি, অন্যকেও এই বিষয়গুলো জানানোর মধ্যে দিয়ে বজ্রপাতে ঝুকি হৃাসে এগিয়ে আসি।

দ্রুত প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন হোক

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৬১ নং আইনের (১) উপধারায় বলা আছে পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমে তিন সদস্যের চেয়ারম্যান প্যানেল, সদস্যগণ তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করবেন। তবে তিন সদস্যের গঠিত চেয়ারম্যান প্যানেলের মধ্যে একজন সংরক্ষিত নারী সদস্য থাকতে হবে।

কিন্তু মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া, সাহারবাটি ও কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা এই আইনের তোয়াক্কা না করে প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন করেননি। মেহেরপুর প্রতিদিন এ গতকাল রবিবার বিষয়টিতে গুরত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, পরিষদের প্রথম সভার ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও ওই তিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন। তবে ইউপি সদস্যদের অভিযোগ, প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন হলে চেয়ারম্যানদের সুযোগ সুবিধা কমে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তারা নাকী প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন করেননি।

কিন্তু আইনে বলা আছে, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বা অনুপস্থিত থাকলে চেয়ারম্যানের প্যানেল থেকে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের সব দায়িত্ব পালন করবেন। পদত্যাগ, অপসারণ বা মৃত্যুজনিত কারণে

চেয়ারম্যান পদ শূন্য হলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান প্যানেলের কোনো সদস্য চেয়ারম্যানের সব দায়িত্ব পালন করবেন।

চেয়ারম্যানরা ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন কাজে মাঝে মধ্যেই জেলার বাইরে যান। তাহলে ওই সময় ইউনিয়ন পরিষদে নাগরিক সেবা কারা দিয়ে থাকেন? নাকী প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন না হওয়ায় ওই তিন ইউনিয়নের নাগরিকরা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বিষয়টি নিয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেছেন, এসব চেয়ারম্যানদের প্যানেল চেয়ারম্যান গঠণের জন্য আনুমানিক ২ মাস আগে চিঠি দেওয়া হয়। চেয়ারম্যান প্যানেল গঠন করে তাদের রেজুলেশন কপি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু গত শনিবার ১৮ জুন পর্যন্ত সেটা দেইনি তারা। এর পরেও তারা গতকাল পর্যন্ত প্যানেল চেয়ারম্যান গঠনের কোন রেজুলেশন দিয়েছেন কীনা তা মেহেরপুর প্রতিদিনকেও নিশ্চিত করা হয়নি।

এমতাবস্থায়, জনগণের কাঙ্খিত সেবা যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে স্থানীয় সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকেই দেখতে হবে। আশা করবো দ্রুত সময়ের মধ্যে ওই ইউনিয়ন গুলোতে প্যানেল চেয়ারম্যান গঠনের জন্য সংশ্লিষ্টরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বন্যার্তদের সহযোগীতায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে

ভারতের মেঘালয় ও আসামে ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়ে ইতোমধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, রংপুর ও কড়িগ্রাম জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের।

সিলেটের সাথে সারাদেশে সকল ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে। আকাশপথ, রেলপথ, সবশেষে সড়ক পথের যোগাযোগও। নিরাপত্তাজনিত কারণে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্কও

বন্ধের পথে। সিলেট বিভাগের ৮০ ভাগ এখন পানির নিচে। এক করুণ অবস্থায় সিলেট বিভাগের মানুষ।

সিলেট, সুনামগঞ্জসহ কয়েকটি এলাকায় বন্যার কারণে সারা দেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

উজান থেকে নেমে আসা পানিতে চলতি মৌসুমের তৃতীয় দফা বন্যা দেখা দিয়েছে সিলেট অঞ্চলে। এর আগে গত এপ্রিলে সিলেটের নিম্নাঞ্চলে অসময়ে বন্যা দেখা দেয়। এরপর মে মাসের মাঝামাঝিতে সিলেটে ১৮ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়।

প্রতিবছরই বন্যা আসে প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু দেশের নদ-নদীগুলোর এখন যে অবস্থা, তাতে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হয়ে সাগরে যেতে পারছে না। বেশির ভাগ নদী ভরাট হয়ে গেছে। গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় পানি ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়েছে অনেক নদী। সে কারণে যতই দিন যাচ্ছে বন্যার স্থায়িত্ব ও ভয়াবহতা বাড়ছে।

সরকারি, বেসরকারি, এনজিও, বিভিন্ন সংগঠন বন্যার্তদের সহযোগীতায় যে যার মত এগিয়ে এসেছে। স্মরণকালের ভয়াবহ এ বন্যা মোকাবেলায় এসকল ত্রাণ সামগ্রী খুবই অপ্রতুল। বন্যা নিয়ন্ত্রণে এখনই স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে আপাতত দাঁড়াতে হবে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে। পর্যাপ্ত ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সব প্রান্ত থেকে যার যার সাধ্যমত বন্যার্তদের পাশে দাড়াতে হবে। বন্যাকবলিত এলাকায় পানিবাহিত রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধসহ মেডিক্যাল টিম পাঠাতে হবে।